বৌমাদি

— তপন অধিকারী

উপরের বার্থে কল্যানী বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। নীচের বার্থে আমি বসে আছি। জানলাটা খোলা রেখে বাইরে তাকিয়ে আছি একরাশ ভাবনা নিয়ে। হাল্কা নীল আলোটার জ্বলে থাকা স্মৃতিকে আরও পশ্চাদগামী করে তুলেছে। প্রকৃতিও ভাবালুতায় আচ্ছন্ন। রাত প্রায় পৌনে বারোটা। পশ্চিম আকাশে চাঁদটা উঁকি দিচ্ছে। বেশ বড় আকারের, কিন্তু আধখানা চাঁদ। এখন কৃষ্ণা সপ্তমী।

মাদ্রাজে আরও অনেকবার গিয়েছি। কিন্তু ফিরে আসাটা কখনও এমন বিষন্নতায় ভরে ওঠেনি। স্টেশনে রিংকু আর সুবল এসেছিলো বিদায় জানাতে। ট্রেন ছাড়ার মুহূর্তটা কেমন ভারী ভারী লাগছিলো। আর ওদের বাড়ী থেকে বিদায়ের দৃশ্যটা বুক ফাটাচ্ছিলো। দিদি তখন আমার দিকে আর আমাদের দিকে তাকিয়েছিলো, মিছিমিছি হাসছিলো। আসলে কাঁদছিলো। মনে মনে। শব্দহীন হাহাকার। আমার বা আমাদের জন্যে নিশ্চয় নয়। আমরা এসেছিলাম, চলে যাচ্ছি। খানিকটা সেজন্যে হলেও আসলে নিশীথদাটাই একেবারে যাচ্ছেতাই। মাত্র সাতান্নোয় চলে গেল। এটা-কি যাবার একটা বয়স না-কি!

দিদিতো শুধু দিদি নয়, আমার বড়শালী। কলকাতায় এসেছিলো স্বামী-স্ত্রীতে। মাদ্রাজ বা চেন্নাই ফিরে গেল স্বামীহারা হয়ে। কে আর জানতো এমনটা হবে। তবে মানুষটা বেশ আমুদে ছিলো। খেয়ে ও খাইয়ে খুব তৃপ্তি পেতো। অতিথিপরায়নতায় তার জুড়ি মেলা ভার। আর এসব ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীতে তাদের একশো ভাগ মিল। যাকে বলে মেড ফর ইচ আদার। তবে মুশকিলটা ছিলো তার শারীরিক এক সঙ্গীকে নিয়ে। ডায়াবেটিস। সংগীটি ভেতরে ভেতরে তাকে যে এতটাই শেষ করে এনেছিলো সেটা সে বুঝতে পারেনি। কেউ-ই পারেনি।

এখন চাঁদটা আস্তে আস্তে উঠে পড়ছে। আকাশ বেয়ে। প্রকৃতির অন্ধকার রাজত্ব ম্লান আলোয় ভরে উঠছে। উঠুক। আমার অনেক কিছুই মনে পড়ছে। আমি এখন ভাববো। সময়ের বিপরীত স্রোতে পাড়ি দেব। স্মৃতির দরজা খুলে।

.... প্রায় চব্বিশ বছর আগে নিশীথদারা ব্যাঙ্গালোর চলে যায়। পেশাগত জীবনে উন্নতির আশায়। পিংকুটা তখন ছোট্ট। আমারও প্রথম ব্যাঙ্গালোর যাওয়া, সস্ত্রীক — হনিমুনে। অনেকদিন কাটিয়েছি ওদের সঙ্গে। অবশ্য ঘুরে

বেড়ানোর ব্যাপারে নিশীথদা একটু বে-রসিকে ছিলো। বৃন্দাবন গার্ডেন্স ছাড়াও মহীশুরটা ঘুরে বেড়িয়েছি দিদি, আমি আর কল্যাণী। বেশ ভাল লেগেছিলো। বছর দুয়েক পরে নিশীথদারা মাদ্রাজে চলে আসে। তারপর থেকেই ওদের সেখানে থাকা। কর্মসূত্রে বহুবার আমাকে ওখানে যেতে হয়। একা অথবা সস্ত্রীক। আর ওখানে যাওয়া মানেই নিশীথদাদের কাছে থাকা। ওরাও কলকাতায় এলে আমাদের কাছে থাকে, কখনও আবার শ্বশুরবাড়ীতে।

পর পর সব আমার মনে পড়ছে। একে একে। আসলে আমি ভাবছি। ভাবার এমন পরিবেশ সহজে পাওয়া যায় না। ট্রেনের দু-বার্থের কুপেটা এখন হালকা নীল আলোয় নিশ্চুপ। কৃষ্ণা সপ্তমীর চাঁদ তার ম্লান আলো ঢেলে নিসর্গকে নিষুপ্ত রেখেছে। মন খুলছে। পশ্চাদগামী ভাবনা এখন বাধা-বন্ধনহীন।

কল্যাণী ঘুমোচ্ছে। ওরা তিন বোন, এক ভাই। কল্যাণী মেজো, দিদি বড়। কল্যাণীর পর ভাই, সবশেষে ছোটবোন। ভাই, অর্থাৎ আমার শালাকে নিয়ে আমাকে কখনও বেশী ভাবতে হয়নি। তবে ওর বিয়েতে তিন জামাইবাবুকেই দাঁড়াতে হয়েছিলো। নিশীথদা ছিলো এ পক্ষের পান্ডা। আমার বিশেষ ভূমিকা ছিলো শালাজ নির্বাচনে। অবশ্যই আমার শ্বশুরবাড়ীর সংগে যথাসম্ভব খাপখাওয়ানোর দিকে নজর রেখে। শ্বশুরমশাই আগেই গত হয়েছেন। শ্বাশুড়ীমাতা পুত্রবধূ পেয়ে খুশীই মনে হয়েছেন। যাইহোক, শালাকে নিয়ে বেশী ভাবতে না হলেও তার বোনেরা কিন্তু সবাই আমাকে বেশ ভাবিয়েছে। ভাবনার তো কোনও ট্যাক্স লাগে না, তাই যা ইচ্ছে ভাবার কোনও বাধাও নেই। তাতে কল্পনার রঙ ধরিয়ে রোমান্টিক হতেই-বা আটকাচ্ছে কোথায়। কল্যাণী জীবনসঙ্গিনী হিসেবে তার অবস্থানে অটল। সেখানে আমার কিছু করার নেই। কিন্তু তাতে কি হয়েছে। আমার সূক্ষ্ম অনুভূতি তাকে ছাপিয়ে তার দুদিকেই প্রসারিত হচ্ছিলো। বড়শালী আর ছোটশালীতে। এটাও বোধহয় বহুগামিতা। তা সে সব অর্থে বেশী কিছু না হলেও, মানসিকভাবে অনেক কিছুই।

রাজা দশরথের তিন রাণী ছিলো। আমারও বড়বৌ, মেজবৌ, ছোটবৌ থাকতে দোষ কি? পিংকুটা তখন একটু বড় হয়েছে। ওকে আমি ডাকতাম রামচন্দ্র বলে। নিশীথদা আমাকে খুবই ভালবাসতো। কিন্তু তার মানে এই নয় যে বড়শালীকে আমি বড়বৌ বলবো! নিশীথদা রেগেই যেতো। আমাকে বলতো — না, না বড়বৌ-টৌ বলবে না। আমি কিন্তু ওসব শুনতাম না। কারণ, নিজের প্রতি নিজেরই আরোপিত

বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আমি আটকে ছিলাম। সত্যি সত্যিই আমি তো রামচন্দ্রের জনক হইনি। কোথায় থামতে হয় সবকিছু বজায় রেখে — আমি খেয়াল রাখতাম।

..... তারপর আমি সত্যি সত্যি বাবা হলাম। কল্যাণীর মেয়ের বাবা। তারও অনেক পরে ছোটশালী দুই সন্তানের জননী হলো। দশরথের ছোটবৌ সুমিত্রার মত। কিন্তু এক্ষেত্রে দুটোই কন্যাসন্তান। কোন কিছুই মিলছে না দশরথের সঙ্গে। এদিকে নিশীথদা রেগে যায়। সামনে কিছু না বললেও ছোটভায়রাও রেগে যায় আমার উপর। অতঃপর আমি ওসব ছেড়ে দিলাম। ছেড়ে দিলাম মানে আমার আর দশরথ হওয়া হলো না এ যাত্রায়।

..... তা নাই হোক। মহাকাব্যের রাজার মত নাই-বা হলাম। জীবনে কাব্যময়তার অভাব না ঘটলেই হলো। মাদ্রাজে গেলেই সমুদ্রের ধারে আমার যাওয়া চাই-ই। অন্তত: এক বিকেল এক সন্ধ্যের জন্যে। নিশীথদা পেলে ভালো, না পেলেও খারাপ নয়। প্রাক্তন বড়বৌ যেতোই। প্রাক্তন, কারণ আমি তো দশরথ হওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

.... একবার নিশীথদারা কলকাতায় এসেছে। বড়শালী তখন দ্বিতীয়বারের জন্যে অন্তঃসত্ত্বা। ইয়ার্কি-ঠাট্টা খুব চলতো। আমি বলতাম এবার পিংকুর একটা বোন হোক। সবারই সেই ইচ্ছে। মেয়ে হোক মেয়ে হোক বলে আমি খুব জ্বালাতন করেছি। কিনিকিনি শব্দটা আমি কোথায় পেয়েছি মনে নেই। পাঁচ মাসের গর্ভাবস্থায় ঈপ্সিত সন্তানের নাম রেখেছিলাম কিনিকিনি। নিশীথদারা চলে যাবার সময় তাদের বেডিং-এ চুপিসারে ছোট্ট একটা মেয়েপুতুল ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। সেটা ছিল সাদা কাপড়ে মোড়া, আর তার ভেতর একটা কাগজে লেখা ছিলো 'কিনিকিনি'। এসবের মধ্যে বেশ মজা ছিলো — মিষ্টিমিষ্টি আনন্দ। বলেছিলাম, মেয়েটা খুব ফরসা হবে — মায়ের মত। আর বড় হলে খুব লম্বা, কালো চুল হবে — সেটাও মায়ের মতই। কিন্তু মেলেনি, শুধু ফরসা হওয়া ছাড়া। পিংকুর ভাই হয়েছিলো। রিংকু।

মিষ্টি মিষ্টি পাকামি আমি বরাবর করে এসেছি। তখন ওরা কলকাতায় থাকতো। কি একটা ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া। নিশীথদার খুব দাঁত ব্যথা। তাকে ফেলে রেখে বড়শালী বাপের বাড়ী চলে যাবে, এমন একটা অবস্থা। আন্দাজে আমিও ওদের বাড়ী হাজির। নিশীথদার কাছে শুনলাম সেই

দাঁতের ব্যথা আর বাপের বাড়ী যাওয়ার কথা। বড়শালীর কাছে গেলাম— খুব একটা পাত্তা দিচ্ছে না। ইনিয়ে বিনিয়ে, খীর লয়ে বকর বকর করে চা মঞ্জুর করলাম। নিশীথদাকে আগেই বলে দিয়েছি আধঘন্টার জন্যে একটু বাইরে ঘুরে আসতে। সেই সময়ের মধ্যেই বাপের বাড়ী যাওয়া পিছিয়ে দিতে পেরেছিলাম। আসলে বাপের বাড়ী যাওয়া বাতিল হয়ে গিয়েছিলো। এসব আমি ভালো পারতাম। অবশ্য তিন-চারটে শাড়ী নিয়ে সন্ধ্যেবেলা আমাকে আবার আসতে হয়েছিলো যে কোনও একটা পছন্দ করাবার জন্যে। কিন্তু কোনওটাই তার পছন্দ হয়নি। পরদিন আমার সংগে বেহালা মার্কেটে গিয়ে বড়শালী নিজের পছন্দমত একটা শাড়ী কিনেছিলো। এরপর আমি মাদ্রাজে গেলে একবার অন্তত: সেই শাড়ীটা পরতো। আমারও মনে পড়তো সেই দিনটার কথা। শাড়ীর ব্যাপারটা নিশ্চয় তার মনে কোনও সুরের ঝংকার তুলেছিলো। আর সেই সুরে তার মনটা নিশ্চয় নেচে-গেয়ে উঠতো আমি সেখানে গেলে। সত্যি সত্যি কি মনে হত আমি জানতে চাইনি আর সে-ও বলেনি। সব কথা আবার বলা যায় না-কি! তবে শাড়ীটা পরে সে-ও খুশী, আর আমারও বেশ লাগতো।

এই ছোট ছোট বেশ লাগাগুলো জমতে জমতে বেশ মধুর হয়ে উঠেছিলো, আর সেই মধুরতার গভীরতা আমরা কেউই খুব বাড়তে না দিলেও তা বেশ বেড়েছিলো। নিজেকে আমি কখনও উত্তমকুমার ভাবিনি, কিন্তু সিনেমায় উত্তম-সুচিত্রার সেই রোমান্টিক জুটির প্রভাব থেকে কেউ মুক্ত ছিলো কি! কোনও ছেলে বা কোনও মেয়ে, সেই বয়সে? বড়শালীর নাম লক্ষ্মী। সেই লক্ষ্মী কবে থেকে আমার কাছে রমা হয়ে গেছে মনে নেই। চিঠিতে আমি তাকে উল্লেখ বা সম্বোধন করতাম রমাদি বলে। নিশীথদা কথাটা জেনে গেলেও আমাকে কোনওদিন বলেনি। রমাদি কিন্তু কোনও আপত্তি করেনি। উল্টে আমাকে চিঠি দিতো, ইতি রমাদি বলে। হাবভাবে একটু একটু ঈর্ষা প্রকাশ করলেও তার বোনেরা এ ব্যাপারটা নিয়ে কখনও হৈ-চৈ করেনি।

কল্যাণী এখনও ঘুমোচ্ছে। ঘুমোক। আকাশ বেয়ে চাঁদের চলা অব্যাহত। রঙ-চঙে ভাবনাগুলো আরও রঙ চড়িয়ে আমি ভাবছি। আসলে ভাবনাগুলো ছবি হয়ে মনে ভাসছে। তবুও মনটা মাঝে মাঝে ছ্যাঁৎ করে উঠছে। নিশীথদা আর নেই। রমাদির মনে কষ্ট।

বেড়াতে আমি ভীষণ ভালবাসি, রুমাদিও তাই। প্রায়ই হাল্কা অভিযোগ করতো। নিশীথদা বেশী কোথাও নিয়ে যেতো না বলে। একবার বলেছিলো বেড়াতে যাওয়ার প্রোগ্রাম করলে আগে-ভাগে জানাতে। .... বছর চারেক আগের কথা। আমি জানিয়েছিলাম। মাদ্রাজ থেকে ঠিক চলে এসেছিলো কলকাতায়। একা। সেবার আমার ছোটপিসিরাও আমাদের সংগে ছিলো। আর ছিলো আমার বন্ধু স্বপনরা, সপরিবারে। আমি পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। এই যে তোমাদের লক্ষ্মী, আমার রুমাদি। একটু অবাক হয়ে ওরা আমার দিকে তাকিয়েছিলো। রুমাদি মিষ্টি করে হেসেছিলো।

প্রথমে ঘাটশিলা গিয়েছিলাম। পচা গরমে। ফুলডুংরি না কি যেন নাম টিলাটার। দেখেই আঁতকে উঠেছিলো। রুমাদি বলেছিলো অত উঁচুতে উঠতে পারবে না — পায়ে বাতের ব্যথা, রক্তের চাপ বেশী। আমি বলেছিলাম সবাই উঠুক না, আমরা উঠবো না। সবাই উঠে গেলো। আমরা দুজনে গল্প করছি আর হাঁটছি, আস্তে আস্তে। আসলে ঘুরে ঘুরে আমরাও উঠছি। একটু দেরী হলেও সবার সংগে আমরা মিলিত হলাম চূড়াতে। গল্প করতে করতে ব্যথার কথা রুমাদি কখন ভুলে গেছে। ওপরে উঠে বললো, — অপূর্ব সুন্দর!

ঘাটশিলার গরমে ঝলসে আমরা দীঘা গিয়েছিলাম। সমুদ্রের উচ্ছল উদ্দাম তারুণ্যে কদিন বেশ কেটেছিলো। সন্ধ্যের সময় আমাদের গানের আসর বসতো। কোনও গানই বোধহয় পুরোটা কেউ গাইতো না। তবুও সব মিলিয়ে দিনগুলো বড় ভাল লেগেছে। রুমাদি বলেছিলো আবার আসবে, এরকম বেড়াতে।

আমাদের এতসব ভাললাগার ব্যাপার স্যাপার থাকলেও আমরা কিন্তু ভীষণভাবে রক্ষণশীল। আর পরস্পরের প্রতি সেই রক্ষণশীলতা আমাদের আপনিতে আটকে রেখেছে। অর্থাৎ, রুমাদি আমাকে আপনি বলে আর আমিও রুমাদিকে আপনি বলে ডাকি। দুজনেরই এই একই রোগ। ভাবছি রক্ষণশীলতা মানেই একধরনের সতীত্ব। সতীত্ব থেকে সীতা এসেছেই, কিন্তু আমাদের রক্ষণশীলতার গন্ডী লক্ষণের গন্ডী হলে আবার সব ওলোট-পালোট হয়ে যেতো। কারন, তখন একবার অন্তত: সীতা গন্ডী পার হতো। অবশ্য তার আগে আমাকে আবার সোনার হরিন হতে হতো। যাক, ওসব না ভাবাই ভালো।

আমাদের এই আপনিতে আটকে থাকার চুক্তি বা রক্ষণশীলতার চুক্তি লিখিত তো

নয়ই, এমনকি মৌখিকও নয়। তবুও আমরা চুক্তিবদ্ধ। মনে মনে। কবে থেকে ঠিক না জানলেও এ চুক্তি ভদ্রলোকের চুক্তি। কোনওদিন ভাঙবার নয়। এতদিনেও যখন ভাঙেনি, আর সম্ভব নয় ভাঙা। জীবনের অনেকটা পথ আমরা পার হয়ে এসেছি। দুজনেই। স্বাভাবিক নিয়মেই আমরা এগিয়ে চলেছি। সবাই যেমন যায়। জন্মের পর থেকে। নিশীথদার এই এগিয়ে চলাটা তাড়াতাড়ি থেমে গেলেও, কোনও মানুষেরই নিস্তার নেই এই থেমে যাওয়া থেকে। আগে যখন গান গাইতাম, পুরোটাই গাইতাম। 'আমার পরান যাহা চায়' কিংবা 'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে' ইত্যাদি। এখন আর গাই না, পুরোটাতো নয়-ই। রুমাদিও গায় না। তাড়াতাড়ি সময়ের তালে তালে গানও পাল্টে গেছে। এখন গানের সুরে মন গায়। 'এখন আমার সময় হল, যাবার দুয়ার খোল'। কিংবা 'মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান'। মেয়ের বিয়ের পর অদ্ভুত এক প্রতিক্রিয়া হলো, মাত্র এক বছর আগে। মনে হলো যেন বসন্তকে বিদায় দিলাম — নিজের জীবন থেকে। অবশ্য জানিনা সে বিদায় নিলো কি-না।

একবার কলকাতায় আসতে রুমাদির হাত দেখেছিলাম। একটু-আধটু চর্চা ছিলো তখন। হাত দেখেই মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। রুমাদির হাতে লেখা ছিলো বৈধব্যযোগ। কাউকে কিছু বলিনি। ও কথা বলা যায় না-কি! তারপর থেকে আর কারও হাত দেখিনি। এখন হাত দেখার সব ভুলেও গিয়েছি। এবার কলকাতায় সস্ত্রীক এসে নিশীথদা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলো। সেদিনই কল্যাণীকে বললাম রুমাদির বৈধব্যযোগের কথা। আমার হাত দেখার প্রায় কুড়ি বছর পর। হাসপাতালে ভর্তির চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই নিশীথদার অবস্থা খারাপ হয়। রুমাদি তখন ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের বাইরে সিঁড়িতে বসে আছে। সব শেষ হয়ে যাবে একথা আত্মীয়-স্বজনেরা কেউ হয়তো ভাবছিলো না। ডাক্তারের কথায় চেন্নাইতে ছেলেদের ফোন করা হয়েছিলো। আমার বারবার চোখ পড়ছে রুমাদির মুখের উপর। শকুনের চোখ নিয়ে আমি দেখছি আর ভাবছি, রুমাদির এই বেশ আর থাকবে না কাল থেকে। ভীষণ একটা কান্না বুক থেকে উঠে গলায় আটকে যাচ্ছিলো। আমার ঐ বিশ্রী ভাবনা আর কান্না চেপে রেখে নীচে রাস্তায় নেমে এসেছিলাম। একটা গাড়ীর ব্যবস্থা করেছিলাম রাত্তিরে প্রয়োজন হতে পারে বলে। দু-একজন বন্ধুকেও ফোন করেছিলাম, যদি তারা দেখতে আসে নিশীথদাকে, হাসপাতালে। সন্ধ্যেবেলা রুমাদিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, বাপের বাড়ী। হাসপাতালে নিশীথদার এক ভাইপো তাপসকে থাকতে বলেছিলাম, আমি ফিরে না-আসা পর্যন্ত।

শালাকেও তার বাড়ীতে রেখে গাড়ীটা নিয়ে হাসপাতালে ফিরে এসেই শুনি, একটু আগেই সব শেষ! আবার আমাকে একটা বাজে কাজ করতে হয়েছিলো। সারারাত কিছু জানাইনি, ভোরবেলা মৃত্যুসংবাদটা শ্বশুরবাড়ী পৌঁছে দিয়েছিলাম। রুমাদির দিকে তখন আর আমি তাকাতে পারিনি।

পিংকুটা সবেমাত্র সংসারী হয়েছে। রিংকুও প্রায় বড় হলো। আরো ফুটবে। সংসারটা আরও প্রস্ফুটিত হবে। নিশীথদা অকালেই চলে গেলো। সাতান্ন আর কি এমন বয়স। সুবল সপরিবারে চেন্নাইতেই থাকে। কর্মসূত্রে। রুমাদির কাছাকাছি। ও রুমাদির মামাতো ভাই।

রুমাদির শরীরটা বেশ ভারী হয়েছে। হাঁটুর ব্যথাটাও মাঝে মাঝে ভোগায়।

এবার বেশ ক্লান্ত লাগছে। ঘড়িটা খুলে রেখেছি। সময় দেখে ফেললে অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়ার তাগিদ থাকতে হয়তো। চাঁদটা মাঝ রাস্তা পার হয়েছে। আমরাও জীবনের মাঝপথ পার হয়েছি বেশ কিছু বছর আগে। তবুও ফুল ফোটে, পাখি ডাকে। জীবন অনুরাগে উদ্ভাসিত হতে চাইছে। কিন্তু নিশীথদা নেই। সে থাকলেই, মনে হয়, রুমাদি রুমাদি হয়েই এখনও থাকতো। ওদের বাড়ী থেকে আসার সময় সেটাই বেশী বাস্তব হয়ে, রূঢ় বাস্তব হয়ে রুমাদির চোখ-মুখ থেকে প্রকট হয়ে উঠছিলো। সব কেমন পাল্টে যাচ্ছে। রুমাদি আবার লক্ষ্মী হয়ে যাচ্ছে। আবার শুধু বড়শালী অথবা বড়দি। জানিনা, এই শুরু হওয়া পরিবর্তন কোথায় থামবে।